ঘোলাজলের ছিপে নারীবাদ

–বিপ্লব পাল

কেও যদি রবীন্দ্রসাহিত্যের সাথে কোরাণ/গীতাকে গুলিয়ে ফেলেন এবং দুই একটি আয়াত (বা শ্লোক) ধরে যেভাবে মহম্মদ বা কৃষ্ণের কাছা ধরে নাচানাচি করা হয় (কোরাণ বা গীতাও দুয়েকটি আয়াত/শ্লোক ধরে বিশ্লেষন করা উচিত নয়), সেই ভাবেই যদি রবীন্দ্রসাহিত্যের বিশ্লেষন করা সম্ভব বলে অভিজিত রায়ের মনে হয়, তাহলে আমাকে বলতেই হচ্ছে অভিজিত রায় সাহিত্য বা ধর্ম কোনটাই বোঝেন না!

প্রথম কথা হচ্ছে সাহিত্য সমাজের দর্পন-সামাজিক গতিবিধির কোরাণ বা মনুসংহিতা নয়। লেখকের দায়বদ্ধতা চরিত্র এবং প্লট সৃস্টীতে। সব চরিত্রই যদি প্রতিবাদী হবে আর গরম গরম প্রগতিশীল ডায়ালোগ মারবে, তাহলে না দাঁড়ায় গল্প, না পাবো আমরা রবীন্দ্রনাথকে! সেগুলো মুরীর ঠোঙার লিফলেট হবে! সেই জন্য পুরো একটা চরিত্রকে সেই গল্পের প্লটে বিশ্লেষন না করে, বিচ্ছিন্ন ভাবে কোটেশন দেওয়া, আসলেই পল্লবগ্রাহীতা বা কোলকাতার বস্তির ছবি থেকে কোলকাতা ক্যাপশন তুলে দিয়ে নিউইয়ার্কের বস্তির দৃশ্য বলে চালানো!

এবার অভিজিত রায়ের সাহিত্যজ্ঞানের (রবীন্দ্রজ্ঞান অনেক দূরের ব্যাপার) মণি মানিক্য আপনাদের সামনে তুলে দিইঃ

অভিজিত কি নারীর মন বোঝেন?
অভিজিত রায়ের ধারণা ভূপতির প্রতি অভিমানে চারু 'না থাক' বলেছে!

অভিজিত রায় কি জানেন নারী কখন প্রত্যাখান করে আর কখন অভিমান করে? আমাদের পাঠিকারাই উনাকে জানিয়ে দিলে ভালো হয়, যার প্রতি প্রেম নেই নারী তার প্রতি অভিমান করে না!

নস্টনীড়ের গোটা গল্পটাই ভূপতি চারুর মন পাওয়ার জন্য পরিশ্রম করছে। চারু এই উদ্ভট আচরন প্রেমের পরিপন্থী মনে করে, ভূপতিকে প্রত্যাখান করে চলেছে এবং অমলকে আরাধ্য দেবতা করেছে। ভূপতির সাথে তার আচরন স্ত্রীর কর্তব্য মাত্র। সেই জন্যই এটা পরকীয়া গল্প!

'ভূপতি তাহার নিকট হইতে যে মনের সুখ চায় সে তাহা কোনোমতে দিতে পারিতেছে না, ইহা চারু অনুভব করিয়া পীড়া বোধ করিতেছিল। ভূপতি জগৎসংসারের আর-সমস্ত ছাড়িয়া একমাত্র চারুর নিকট হইতেই তাহার জীবনের সমস্ত আনন্দ আকর্ষন করিয়া লইতে চেস্টা করিতেছে, এই একাগ্র চেস্টা দেখিয়া ও নিজের অন্তরের দৈন্য উপলব্ধি করিয়া চারু ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন

করিয়া কতদিন কিরূপে চলিবে। ভূপতি আর-কিছু অবলম্বন করে না কেন। আর-একটা খবরের কাগজ চালায় না কেন। ভূপতির চিত্ত রঞ্জন করিবার অভ্যাস এ পর্যন্ত চারুকে কখনো করিতে হয় নাই, চারুকে সে সর্বতোভাবে নিজের প্রয়োজনীয় করিয়া তোলে নাই;

এই হচ্ছে ভূপতির প্রতি চারুর ভাব-এখানে অভিমানের অবকাশ আছে? চারু যদি অভিমানে 'না থাক' বলে থাকে, তাহলে গোটা গল্পের পরকীয়াটা দাঁড়ায় না! বা গল্পর প্লটও থাকে না!

যে পুরুষ নারীর মনই বোঝে না, সদ্যগোঁফ ওঠা পুরুষের মতন ভগ্নপ্রেমের উপাখ্যান লেখার চেস্টা করে, তার সাথে নারীবাদী সাহিত্য আলোচনা করা আর ছায়ার সাথে যুদ্ধ করা একই ব্যাপার।

বাস্তবের নারীকে বোঝার পর ইবসেন বা বোভায়া পড়লে হয় না?

অভিজিত রায় কি সাহিত্যের চরিত্রনির্মান বোঝেন? না গোটা গল্পটা না পড়ে এখানে ওখানে ছিপ ফেলেন?

ল্যাবরেটরি গল্পের বৈপ্লবিক নারীবাদী চরিত্র সোহিনীর বিশ্লেষনে অভিজিত জানাচ্ছেন সোহিনী জাতিভেদ প্রথা মানত তাই রেবতীকে বলেঃ

' কিছু মনে কোরো না বাবা, তুমি ব্রাস্মণের ছেলে, আমি ছত্রির মেয়ে।' (১)

অভিজিত আরো জানাচ্ছেন ল্যাবেরটরীতে রেবতীর কাছে নীলিমাকে খাদ্যর মতন পরিবেষন করেছেন সোহিনী! নীলিমাকে চিত্তাকর্ষক করাটা সোহিনীর ছেলে ধরার কারসাজি! (২)

সোহিনীর আরো নারীবিরোধী নমুনা পাঠকদের কাছে তুলেছেনঃ

'*মেয়েলিবুদ্ধি বিধাতার আদি সৃস্টি। যখন বয়স অল্প থাকে, মনের জোর থাকে, তখন সে লুকিয়ে থাকে ঝোপেঝোপে, যেই রক্ত আসে ঠান্ডা হয়ে বেরিয়ে আসেন সনাতনী পিসিমা ।*' (৩)

আসুন পাঠক আমরা সোহিনী চরিত্রকে গল্পর প্লটে বিশ্লেষন করি। তাহলেই বোঝা যাবে, অভিজিত রায় না বুঝেছেন সোহিনী চরিত্রকে, না গল্পের প্লটকে। এমন কি শেষের নারীবাদী বক্তব্যকেও (৩) নারীবিরোধী বক্তব্য বলে চালানোর চেস্টা করছেন।

সোহিনী পাঞ্জাবের মেয়ে।

বিবাহ পূর্বে নন্দকিশোরের সাথে কথাবার্ত্তায় আমরা জানতে পারি পুরুষকে কি চোখে দেখে সোহিনীঃ

‘চিড়িয়াখানার কোনো দরকার নেই। যাদের ভিতরে রাখবার, তারা বাইরে সব ছারা আছে। তাই আমি মানুষ খুঁজছি।‘

খুবই স্পস্ট ভাষা। অর্থাৎ নারীর প্রতি দৃস্টিতে অধিকাংশ পুরুষই আসলে চতুস্পদী।

শুধু কি প্রেম! সোহিনী রাজনীতি বোঝে ঝর্ণার জলের মতন।

দেখো-না সরকার বাহাদুর শয়তানির জোরে দুনিয়া জিতে নিয়েছে, খৃস্টানির জোরে নয়। কিন্তু ওরা খাঁটি, তাই রাজ্য রক্ষা করতে পেরেছে।

নন্দকিশোর ছিলেন সেই বিজ্ঞানবাদী পুরুষ-যিনি তার যাবতীয় সঞ্চয়ে গড়ে তোলেন এক অনবদ্য ল্যাবরেটরী। উদ্দেশ্য দেশের যুবকদের বিজ্ঞানমুখী করে তোলা! এতেব বিয়ে করলেন সোহিনীকে।

নন্দকিশোর পতিব্রতা বলতে কি বুঝতেন, এবং সোহিনী তাঁর মৃত্যুর পরেও কি ভাবে সেই ‘*নন্দকিশোরীয় পরিব্রতার*’ ধর্মে অবিচল রইল, সেটাই গল্পের মূল প্লট।

নন্দকিশোরের পতিব্রতার সংজ্ঞাঃ

‘স্বামী হবে এঞ্জিনিয়র আর স্ত্রী হবে কোটনা-কুটনি, এটা মানব ধর্মে নিষিদ্ধ। ঘরে ঘরে দেখতে পাই দুই আলাদা আলাদা জাতে গাঁটছড়া বাঁধা, আমি জাত মিলিয়ে নিচ্ছি। পতিব্রতা স্ত্রী চাও যদি, আগে ব্রতের মিল করাও‘

(আমি শুধু এই ডায়ালোগ দিয়েই দাবী করতে পারতাম, রবীন্দ্রনাথ আসলেই নারীবাদী-কারন এখানে তিনি নারী পুরুষের সমানাধিকার, কর্মক্ষেত্রেও সমান বিচরন দাবী করেছেন। কিন্তু তাহলে আমি অভিজিতের মতন একই ভুল করতাম। আমাকে যেকোন ডায়ালোগ দেখতে হবে গল্পের প্লটে সেই চরিত্রের আইনায়।)

নন্দকিশোরের ব্রত হচ্ছে বিজ্ঞান বাদ-কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই বঙ্গাদেশে ল্যাবেরাটরীর হাতে নাতে শিক্ষার মাধ্যেমে, বিজ্ঞানচিন্তার প্রসার ঘটানো।

এই পোড়া দেশে জ্ঞানের ভোজের উচ্ছিস্ট নিয়ে সস্তাদরের পাত পাড়া হয়।

ওদের দেশে বড়ো বড়ো যন্ত্র ব্যবহারের যে সুযোগ আছে আমাদের দেশে না থাকাতেই ছেলেরা টেক্সটবুকের শুকনো পাতা থেকে কেবল এঁটোকাঁটা হাঁতড়িয়ে বেড়ায়। উনি হেঁকে উঠে বলতেন, ক্ষমতা আছে আমাদের মগজে, অক্ষমতা আমাদের পকেটে। ছেলেদের জন্য বিজ্ঞানের বড়ো রাস্তা খুলে দিতে হবে বেশ চওড়া করে, এই হল ওঁর পণ।

সোহিনীর এই বিজ্ঞানবাদের ব্রতকেই পতিব্রতার মতন রক্ষা করেছেন গোটা গল্পে। এখানে উপনিষদের মানুষের সংজ্ঞা চলে আসে। আমি কে? নন্দকিশোর ই বা কে? সোহিনীই বা কে? তাঁর দেহ আছে, সেটা সর্বনিম্ন স্তর। তার ওপরে আছে মন। সেখানেই সোহিনী পতিব্রতা। তার পতিব্রতা ধর্ম দেহের শুঁচিবাইয়েও নেই, সামাজিক আচরনেও নেই। তাই আমরা দেখি যে, নন্দকিশোরের ল্যাবেরাটরীকে বাঁচাতে সোহিনী কখনো উকিলদের সাথে প্রেমের ভান করছেন, কখনো অধ্যাপক চৌধুরীকে চুম্বন দিচ্ছেন, আবার রেবতীকে ল্যাবরেটরীতে টানতে ধার্মিক বিধবা সাজছেন, জাতপাতের দোহাই দিয়ে রেবতীর মন ভজাচ্ছেন (১)। আবার মেয়েকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করছেন (২)। দেহ-সংস্কারের অনেক ওপরে তার মিশন-নন্দকিশোরের অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এর মধ্যে কোন ভিক্টরীয় গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে?

কিন্তু আসলে সোহিনী নারীবাদী। সেটা তার বিভিন্ন বক্তব্যে স্পস্ট হয়েছে।

'তার উপর নারীর মোহজাল বিস্তার করে দিলে স্থান বুঝে উকিলপাড়ায়। সেটাতে তার অসংকোচ নৈপুণ্য ছিল, সংস্কার মানার কোন বালাই ছিল না।' (ক)

'লোকে ভাবে, আমরা বন্ধুত্ব করে থাকি স্বার্থের গরজে' (খ)

'আমার রাশকরা টাকায় ছাতা পড়ে যাচ্ছে। আমার বয়সে বিধবা মেয়েরা ঠাকুর-দেবতার দালালদের দালালি দিয়ে পরকালের দরজা ফাঁক করে নিতে চায়। আপনি শুনে হয়ত রাগ করবেন, আমি ও-সব কিছুই বিশ্বাস করি নে।' (গ)

(পাঠক, আপনারা দেখছেন (গ) এর সাথে অভিজিত রায়ের (১) খাপ খায় না। সোহিনী আস্তিক। সে ধর্মই মানে না, জাতিভেদ কি মানবে? কারন টাও বুঝতে অসুবিধা হবে না যদি সে অধ্যায়ের বাকী টুকু পড়ে নেওয়া যায়। যেমন সোহিনী ছলনা করে বলছেন ' এসেছি আমার ব্রত উদযাপন করতে। তোমার মতন ব্রাহ্মনতো খুঁজে পাওয়া যাবে না'।

অভিজিত রায়ে (১) থেকে স্পস্ট তিনি (গ) পরেন নি। মানে গল্পটাই পড়েন নি! এখানে ওখানে নারীবিদ্বেশী ডায়ালোগের ছীপ ফেলেছেন!)

কিন্তু হাল যে একলা পুরুষের হাতে। কানে মন্ত্র দেন তাঁরাই, আর জোরে দেন কানমলা। কান ছিঁড়ে যাবার জো হয়। (ঘ)

(এটা ভিক্টোরিয়ান না নারীবাদী ডায়ালগ, অভিজিত বলে দেবেন?)

নারীর দেহপ্রেমের পক্ষে সোহিনীর বলিষ্ঠ বক্তব্যঃ

'মন যে লোভী, মাংসমজ্জার নীচে লোভের চাপা আগুন সে লুকিয়ে রেখে দেয়, খোঁচা পেলে জ্বলে ওঠে। আমি তো গোড়াতেই নাম ডুবিয়েছি, সত্যি কথা বলতে আমার বাধে না। আজন্ম তপস্বিনী নই আমরা। ভড়ং করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে গেল মেয়েদের। দ্রৌপদী কুন্তীদের সেজে বসতে হয় সীতা সাবিত্রী ——' (ঙ)

(এর থেকে শক্তিশালী নারীবাদী বক্তব্য বাংলা সাহিত্যে কেও লিখেছে? সোহিনী জানাচ্ছেন, কুন্তী-দ্রোপদীর মতন বহুগামিতাই নারীর স্বাভাবিক ধর্ম। অর্থাৎ নারী বহুপুরুষকে সম্ভোগ করবে এটাই নারীর ধর্ম! সমাজ জোর করে তাকে এই ধর্ম থেকে বিচ্যুত করেছে।)

এবার আসুন (ঙ) দিয়ে অভিজিত রায়ের (৩) বিশ্লেষন করি।

মেয়েলিবুদ্ধি বিধাতার আদি সৃস্টি। যখন বয়স অল্প থাকে, মনের জোর থাকে, তখন সে লুকিয়ে থাকে ঝোপেঝোপে (৩ক), যেই রক্ত আসে ঠান্ডা হয়ে বেরিয়ে আসেন সনাতনী পিসিমা (৩খ)

সোহিনীর এই বক্তব্য ছিল, রেবতীর আচারসর্বস্ব পিশীমার প্রতি। (ঙ) থেকে জানতে পারছি (৩ক) বা যৌনমুক্ত আচরনই হচ্ছে আসল নারী প্রকৃতি। তাহলে আচার সর্বস্ব পিশীমারা আসেন কোথা থাকে? যারা নারীর এই যৌনদাবীকে সমাজের নিয়ম কানুন দিয়ে দাবিয়ে রাখতে চান? নারী হয়ে কেন নারীর ধর্মের বিরোধিতা?

সোহিনী ইঙ্গিত দিচ্ছেন নারীর ঈর্ষা হচ্ছে এর কারণ। বয়স হলে নারীর যৌন ক্ষমতা যখন লুপ্ত হয়, তারাই হয়ে যায় নারী বিদ্বেশী। কারণটা অবশ্যই যৌনঈর্ষা।

আর সোহিনীর তার মেয়ের জন্য জামাই ধরাতে কোন উৎসাহ ছিল না(২) । সেটা রেবতীকে ল্যাবেরটরী থেকে তাড়িয়ে দেওয়াতেই স্পস্ট।

এইবার আমার মেয়ে ল্যাবরেটরি কে বাঁচিয়েছে। আমি লোক চিনতে পারি নি, কিন্তু আমার মেয়ে ঠিক বুঝেছিল যে ল্যাবরেটরীতে গোয়াল ঘর বসিয়ে দিয়েছিলুম-গোবরের কুন্ডে আর -একটু হলেই ডুবত সমস্ত জিনিসটা।

ল্যাবরেটরি গল্পে অভিজিত শুধু ঘোলা জলে মাছই ধরেন নি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাছের বদলে পচা জুতো তুলেছেন। এবং সেটাকেই মাছ বলে চালানোর চেস্টা করছেন।

গল্প পড়ায় এবং বোঝায় অভিজিতের ধর্য্যের অভাব আছে বোঝাই যাচ্ছে।

কোনটা নারীবাদী কোনটা নারীবিদ্বেশী সাহিত্য অভিজিত বোঝেন?

স্ত্রীর পত্রে মৃণালিনীর চরিত্র বিশ্লেষনে অভিজিত জানাচ্ছেন, নারীর বুদ্ধি যে পুরুষের চেয়ে কম সেটা মৃণলিনীর মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন

তোমাদের ঘরের বউয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেক বেশি দিয়ে ফেলেছেন—(১খ)

পুরো পরিচ্ছেদ পরা যাক। মৃণালিনী রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ট নারীবাদী চরিত্র। এই পত্রের পদে পদে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। তাই অভিজিতের তোলা মাছের স্বাদ আস্বাদন করা যাকঃ

কিন্তু আমার যে বুদ্ধি আছে সেটা তোমাদের পদে পদে স্মরণ করতে হয়েছে। ঐ বুদ্ধিটা আমার এত ই স্বাভাবিক যে তোমাদের ঘরকন্নার মধ্যে এতকাল কাটিয়েও আজও সে টিকে আছে। মা আমার এই বুদ্ধিটার জন্য বিষম উদ,বিগ্ন ছিলেন, মেয়ে মানুষের পক্ষে এ এক বালাই। যাকে বাধা মেনে চলতে হবে, সে যদি বুদ্ধিকে মেনে চলতে চায় তবে ঠোকর খেয়ে খেয়ে তার কপাল ভাঙবেই। কিন্তু, কী করব বলো(১ক)। তোমাদের ঘরের বউয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেক বেশি দিয়ে ফেলেছেন (১খ), সে আমি ফিরিয়ে দিই কাকে। তোমরা আমাকে মেয়ে জ্যাঠা বলে দুবেলা গাল দিয়েছ। কটু কথাই হচ্ছে অক্ষমের সান্ত্বনা ; অতএব সে আমি ক্ষমা করলাম (১গ)।

একটা দশ বছরের ছেলেও বুঝবে এটা পুরুষের নারীর বুদ্ধিহীনতায় খুশী থাকার বিরুদ্ধে মৃণালিনীর প্রতিবাদ। এই শক্তিশালী নারীবাদী বক্তব্যকে কাঁট ছাট করে, নারীবিদ্বেশী করে তোলাতো হয় অন্ধের হস্তি দর্শন বা শ্রেফ সস্তার হাত সাফাইয়ের চেস্টা।

আর মৃণালের ধর্মাশ্রমে যাওয়ার চেষ্টা?

মৃণালের সামনে অপশন কি কি? ধর্মাশ্রমে যাওয়া না বৌবাজারের বেশ্যাপল্লীতে

যাওয়া? তাকে তো কোথাও যেতে হবে? বাপের বাড়ি যাওয়া মানে তো কয়েকদিন বাদে শশুর বাড়িতেই ফিরতে হবে। প্রতিবাদ করতে কি তাকে চাঁদে পাঠাবেন রবীন্দ্রনাথ? মৃণালের চরিত্রটা কি? যৌনস্বাধীনতা নয়, তার শিক্ষা, তার নারী-মানবিকতার যে দলন পুরুষতন্ত্রের হাতে উঠতে বসতে হচ্ছে, তারই প্রতিবাদ। পুরুষতন্ত্রের দমনের প্রতিবাদ করতে বেশ্যাপল্লীতে ওঠা যে পুরুষতন্ত্রকেই বাহবা দেওয়া সেটা, মেরী উলস্টনক্রাফট (1792:A Vindication of the Rights of Woman) স্পস্ট করেই লিখেছেনঃ [Chap. VII. Modesty.—Comprehensively Considered, and Not as a Sexual Virtue]

(6)The shameless behaviour of the prostitutes, who infest the streets of London, raising alternate emotions of pity and disgust, may serve to illustrate this remark. They trample on virgin bashfulness with a sort of bravado, and glorying in their shame, become more audaciously lewd than men, however depraved, to whom this sexual quality has not been gratuitously granted, ever appear to be. But these poor ignorant wretches never had any modesty to lose, when they consigned themselves to infamy; for modesty is a virtue not a quality. No, they were only bashful, shame-faced innocents; and losing their innocence, their shame-facedness was rudely brushed off; a virtue would have left some vestiges in the mind, had it been sacrificed to passion, to make us respect the grand ruin.

মৃণালের নারীবাদী প্রতিবাদে আমি বারবার মেরী উলস্টনক্রাফটের বক্তব্য শুনতে পেয়েছিঃ

আমি তাই বলি, মেয়েমানুষকে দুঃখ পেতেই হবে এইটেই যদি তোমাদের ব্যবস্থা হয় তা হলে যতদূর স ম্ভব তাকে অনাদরে রেখে দেওয়া ই ভালো; আদরে দুঃখের ব্যথাটা কেবল বেড়ে ওঠে।

——জীবন আমাদের কীই বা যে মরণকে ভয় করতে হবে? আদরে যত্নে যাদের প্রাণের বাঁধন শক্ত করেছে মরতে তাদেরই বাধে (২)

মেরীর বক্তব্য (একদম এক নয়, ভাবটা একই) **/Chap. II. The Prevailing Opinion of a Sexual Character Discussed]**

(4) How grossly do they insult us who thus advise us only to render ourselves gentle, domestic brutes! For instance, the winning softness so warmly, and frequently, recommended, that governs by obeying. What childish expressions, and how insignificant is the being—can it be an immortal one? who will condescend to govern by such sinister methods

মৃণালের আরো প্রতিবাদ শোনা যাকঃ

কুষ্ঠ রোগীকে কোলে করে তার স্ত্রী বেশ্যার বাড়িতে নিজে পৌঁছে দিয়েছে, সতীসাধ্বীর সেই দৃষ্টান্ত তোমাদের মনে জাগছিল। জগতের মধ্যে অধমতম কাপুরুষতার এই গল্পটা প্রচার করে আসতে তোমাদের পুরুষের মনে আজ

পর্যন্ত একটুও সংকোচ বোধ হয় নি; সেই জন্যই মানবজন্ম নিয়েও বিন্দুর ব্যবহারে তোমরা রাগ করতে পেরেছ, তোমাদের মাথা হেঁট হয় নি। বিন্দুর জন্য আমার বুক ফেটে গেল, কিন্তু তোমাদের জন্য আমার লজ্জার সীমা ছিল না (৩)।

মৃণাল কি বন্দুক হাতে পুরুষের প্রতিবাদ করবে?

মীরাবাঈ সমকালীন শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক নারীবাদী। অভিজিত ভুলে যাচ্ছেন ধার্মিক এবং আধ্যাত্মিকতার পার্থক্য। ধার্মিক খোঁজে বন্ধন, আধ্যাত্মাতিক খোঁজে মুক্তি! রাগ, অহং, ঘৃণা, কামনা থেকে মুক্তি। *'ছারুক বাপ, ছারুক মা'* ব্যাপারটা অভিজিতের বোধগম্য হয় নি। এর মানে, সংসার থেকে মুক্তি, বন্ধন নয়!

(*আমি আগেই বলে ছিলাম অভিজিত হিন্দুদর্শন বোঝেন না। এটা উদাহরন।*)

সমস্যা হচ্ছে যখন মেরী বলবেন সেটা নারীবাদী। যখন আমাদের মৃণাল বলবে তখন সেটা ঝরা পাতা। সাধে কি এই শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিদের প্রতি রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ

এই পোড়া দেশে জ্ঞানের ভোজের উচ্ছিস্ট নিয়ে সস্তাদরের পাত পাড়া হয়

যাইহোক রবীন্দ্রসাহিত্যের পল্লবগ্রাহী আলোচনা আমার ভালো লাগে না। পরে সময় পেলে, অভিজিতের অন্য অভিযোগ গুলোর জবাব দেব। আপাতত আমরা জানলাম অভিজিত নারী বোঝেন না-নারীবাদী সাহিত্যে ছিপ ফেলে ডায়ালগ তোলেন। সেটাও বোঝেন না অনেক সময়। আমার ধারণা উনি নিজের নারীকে না বুঝে মেরী উলস্টনক্রাফট বোঝার চেস্টা করছেন।